পরিক্রমা

চিন্ময়ী মা

মায়ের মহাপূজার লগ্নে সন্তান আনন্দের সন্ধান পায়। সে-মায়ের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের বোঝাপড়া নেই। মা শরণাগতবৎসলা। সন্তান তাঁর শরণ গ্রহণ করলেই তিনি তৃপ্ত। অফুরন্ত স্নেহের দানে প্রাণ ভরিয়ে দেন বিশ্বজননী। দুর্গাপূজার সরণি বেয়ে মা নানারূপে আসেন। মা লক্ষ্মী, মা কালী, মা জগদ্ধাত্রী—এঁদেরও পরপর পূজামণ্ডপে আগমন ঘটে। বাংলায় দেবীদের পূজা-আহ্বানে মানুষ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বাংলার প্রকৃতিও পূজার নৈবেদ্য নিবেদনে ধন্য হয়। খেত শস্যে, বৃক্ষ ফলে ফুলে আকুল হয়। মায়ের আগমনের রেশ ধরে রাখে। সংসারে মেলে আনন্দের সাড়া।

পূজার এই অপূর্ব আবহের মধ্যেই নতুন জীবনের আভাস। অন্তর দেবীর প্রসাদে ভরিয়ে পথচলার ছন্দ বদলায় মানুষ। একটা অশান্ত ঢাকের বাজনা বেজে ওঠে গুড়গুড় করে—জীবনযাত্রার পথে চলার প্রেরণা হয়ে যায় দেবীর আগমনী চিত্রগুলি। দেবীর উজ্জ্বল সাজগোজ দেখে এক পাগল বলেছিল—মা, যতই সাজগোজ কর, তিনদিন পর তোমায় জলে ভাসিয়ে দেবে। এই তো মানুষের জীবন! কত রঙিন অভিজ্ঞতা, কত মধুময় স্মৃতি, কত উদ্বেল আনন্দ-প্রবাহ—সবই একসময় নিশ্চিহ্ন হয়। শরতের আকাশে মেঘের খেলা, সোনা-রোদের আলোঝরা আশীর্বাদ, পদ্মে ভরা জলের লক্ষ্মীশ্রী, সবুজ নবপল্লবের চিকন রূপ—সবই কালের গর্ভে মিলিয়ে যায়। বসন্তের জয়পতাকা প্রকৃতির প্রাঙ্গণে ফুলের স্তবকে সুগন্ধ ছড়ায়। শীতের আমন্ত্রণে প্রস্তুত হয় ধরণী। এমনি করেই কালের চক্র ঘোরে। ঋতুচক্রের অবদানে আসে বৈচিত্র্য, আসে নব নব প্রেরণা। মায়াবী প্রকৃতি তার মুগ্ধতার জাল বিছিয়ে রাখে। কে-ই বা জানত পৌষমেলার আনন্দময় কালে সবুজ পাতায় ভরা বেলগাছের ছায়ায় আসবেন এযুগের দেবী! বলবেন মধুর স্বরে দারিদ্র্যে ভরা কুটিরের ঘরনিকে : আমি তোমার ঘরে এলাম, মা। শ্যামাসুন্দরী দেখলেন বেলগাছ থেকে নেমে এল সোনার বরন বালিকা। গলা জড়িয়ে বার্তা নিজমুখেই জানাল। কচিকণ্ঠের ঘোষণায় মর্ত্যের বাবা-মাকে চিহ্নিত করলেন মহামায়া। কোনও জাঁকজমক নেই, নেই ভুবনজোড়া আলোর রামধেনু। মায়ের আগমনী বেজে উঠল দরিদ্রের, নিঃস্বের কুটিরে। পিতা রামচন্দ্র সুভদ্র, সরলতায় ভরা, আপন-পর নেই। পথচারীকে ডেকে আলাপ করে তামাক খাওয়ান। গৃহে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অর্চনা করেন। তাঁর প্রতি ভক্তি-প্রীতিতে অন্তর পূর্ণ। তাই বালিকামূর্তিতে মা সীতাই বুঝি জন্ম নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

ইতিহাসের পাতায় শক্তির আবির্ভাব নিয়ে কত জ্ঞানী, কত ভক্ত গভীর তত্ত্বকথা লিখেছেন। কিন্তু মা যে সত্যিকারের মা, কথার কথা মা নন! তাই আশ্বাস দিলেন সকল সন্তানদের—তিনি সতেরও মা, অসতেরও। নিজের মুখে সন্তানকে বললেন—তিনি পাতানো মা নন, সত্যজননী। তিনি সন্তান বলে গ্রহণ করেছেন মুসলমান ডাকাত আমজাদকে, অন্যদিকে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ শরৎকে। তাঁর চিত্ত করুণায় বিগলিত, সেখানে নিষ্ঠুরতা নেই। এমন একটি বিরাট মনের দেবী আমাদের কল্পনাকে অতিক্রম করে যান। ''যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।''

দশভুজারূপে এই মা সাধুদের মঠ ধন্য করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ উভয়েই চিন্ময়ীরূপে তাঁর আগমন মানসচক্ষে দর্শন করেছিলেন। শেষমুহূর্তে মৃণ্ময়ী মূর্তিও পাওয়া গেল। মায়ের ইচ্ছা কে রোধ করে! স্বামীজীর মনে সংকল্প জাগল জ্যান্তদুর্গা পূজার। মৃণ্ময়ী ও চিন্ময়ী মিলিত হয়েছেন যে-সত্তায় তাঁর সান্নিধ্যে পূজার সূচনা। শ্রীশ্রীমা এলেন সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে বেলুড় মঠের পুণ্যভূমিতে। এ যেন দ্বিতীয় বোধন। গেটের দুপাশে

কলসে সবুজ কদলীপত্র, স্বস্তিকাচিহ্ন নিয়ে সব জ্বলজ্বল করছে। মা শ্রীচরণ রাখলেন কার্পেট বিছানো পথে। সাধু-ব্রহ্মচারীদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা, সমাদর যেন পুষ্প হয়ে ঝরে পড়ছে। আনন্দময়ীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা মূর্তি থেকে সেদিন সকলের অগোচরে আনন্দ তরঙ্গিত হল। জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল মঠের আকাশ-বাতাস। এ সবই কালের চিত্রপটে অক্ষয় রূপ নিয়েছে।

মঠে তখন দুটি পূজা—একদিকে মৃণ্ময়ী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা, অন্যদিকে অবগুণ্ঠিতা চিন্ময়ী বিগ্রহের পদতলে শত শত সন্তানের পুষ্পাঞ্জলি। শক্তির নররূপে আবাহন। ভক্তের হৃদয়ে এ-দুটি পটচিত্র মিলিত হয়ে দুটি লীলার বিচিত্র তরঙ্গ তোলে।

এবারের মাতৃলীলায় যুদ্ধবিগ্রহ ও অস্ত্রের ঝনঝনা নেই। মাটির ঘরে মাটির প্রদীপে নিভৃতে আলোকবর্ষিণী মায়ের গোপন প্রকাশ। মুক্তিক্ষেত্র কাশীতে একবার মুক্তিদাত্রী মা এসেছেন। সঙ্গে গোলাপ-মা প্রমুখ রয়েছেন, তাঁকে মা বলছেন পরিধেয় ছিন্ন বস্ত্রখানি সেলাই করে দিতে। মা অন্নপূর্ণার বৈভব-প্রাচুর্যে ভরা মুক্তিনগরীতে মা সারদা যেন ভিখারি শিবের গৃহিণী। মায়ের চেহারাও একান্ত সাদাসিধে—ঐহিক মানুষ জানতে বুঝতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, তিনি রূপ ঢেকে এসেছেন। ভক্তেরা গোলাপ-মাকে দেখে মুগ্ধ। মা ঠাকরুন বোধে তাঁর চরণেই শরণ নিচ্ছেন। গোলাপ-মা বললেন এক আশ্চর্য কথা—''দেখছ না, মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?''

দেবীমুখের অনন্ত প্রসন্নতা তো সবাই দেখতে পায় না। এবার দেবীর অনন্ত বৈভব নিয়েই মায়ের সহজ সরল প্রকাশ। মহামায়া মানুষের বোধবুদ্ধিকে আবৃত না করে তাকে প্রজ্ঞার আলোকে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত করেছেন আর আবৃত করেছেন নিজের দিব্যস্বরূপ। সন্তানদের মুক্তি ও ভক্তি, প্রজ্ঞা আর বিবেক দু-হাতে বিতরণ করছেন আড়াল থেকে। তিনি এসেছেন দুর্গাশক্তি নিয়ে। সে-শক্তির বর্ণনা আছে দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। 'সমস্তদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা'—তিনি সমস্ত দেবতাদের শক্তিসমূহ নিয়ে মূর্তিমতী হয়েছেন। দেবতেজে নির্মিত তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তেজোময়ী সেই মূর্তির তুলনা ত্রিজগতে নেই। শ্রীমা সেই অখিল দেবশক্তির বিগ্রহ, সকল অবতারশক্তির আধার—তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপিণী; ব্রহ্মার সৃজনশক্তি, বিষ্ণুর পালনশক্তি, আবার মহাকালের ধ্বংসশক্তি। তিনিই নিজের সৃষ্টির মধ্যে এসেছেন, প্রাণরূপে বিলাস করছেন, জীবধাত্রীরূপে পালন করছেন। এই অপূর্ব শক্তিকে আহ্বান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধনলভ্যা সেই দেবী কৃপাসুমুখী হয়ে এযুগে প্রকাশিত। এই অভূতপূর্ব প্রকাশ জীবকল্যাণে। জীবের জন্য তাঁর কল্যাণী মূর্তিই সন্তানকে মোহিত করে। সন্তানবৎসলা, ভক্তবৎসলা দেবী কোঠারে একদিন নিজের মনে স্বগতোক্তি করেছিলেন—''বারবার আসা—এর কি নিস্তার নেই?... তবু তো লোকে বোঝে না—কত কষ্ট ঠাকুর করছেন, তাদের জন্যে।... বাছারা আমার কাঙাল। একবার 'মা' বলে ডাকলে কি থাকা যায়?''

পিপীলিকান্ত-জননী পিঁপড়ের মধ্যেও দর্শন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি। অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে বহুধা প্রসারিত জীবজগতে তিনি লীলার সহায় হয়েছেন। তাঁর উপমা তিনিই।

সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি সর্বদেব-দেবীস্বরূপা। এমন পূর্ণ প্রকাশ কখনও দেখা যায়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহান গুরুভাব মন্ত্রদাত্রী ভক্তজননীর মধ্যে প্রকটিত হল। দলে দলে পরিচিত অপরিচিত তাঁর আকর্ষণে তাঁর চরণপ্রান্তে উপনীত হতে লাগল—এ এক মহা রহস্য! রবাহূত, অনাহূত সব কার ইঙ্গিতে অমৃতলোভী ভ্রমরের মতো তাঁকে ঘিরে ধরেছিল—সেকথা আজও প্রকাশিত হয়নি। অবতারের তারণশক্তি যেন মায়ের মাধ্যমে শত সহস্রধারায় জীবের শিরে বর্ষিত হয়ে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাই যেন দেহধারণ করে দুটি মঙ্গলহস্ত প্রসারিত করে অপেক্ষমাণ। ত্রিভুবনে তাঁর মহিমার তুলনা কোথায়! যুগাচার্য বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন, ''তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই!''